بسم الله الرحمن الرحيم

জুমুআর খুতবা (২ মার্চ ২০১২)

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের লন্ডনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ২ মার্চ ২০১২-এর (২ আমান, ১৩৯১ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ (آمين)

আমি আজ আবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সম্মানিত সাহাবাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত কিছু ঘটনার উল্লেখ করব। তাঁরা আহমদীয়াত গ্রহণের পর কেমন সাহসিকতা ও বীরত্ব প্রদর্শন করেছেন তার সাথে এর সম্পর্ক। এর মাধ্যমে এটিও বুঝা যায় যে, তারা কত গভীরভাবে ধর্ম ও কুরআনকে বুঝার চেষ্টা করেছেন। একবার অনুধাবন ও গ্রহণের পর তারা এ পথে সকল প্রকার কষ্ট ও অত্যাচার সহ্য করেছেন। সাহাবাদের বর্ণিত ঘটনাবলী বিভিন্ন শিরোনামে রেজিষ্টারে সংকলিত হয়েছে; তা থেকে আমি বিভিন্ন সময় উপস্থাপন করে থাকি।

যাহোক সাহাবীদের বীরত্ব ও সাহসীকতা সম্বন্ধে কিছু ঘটনা এখন উল্লেখ করছি। মিয়াঁ আব্দুল আযীয সাহেব (রা.) যিনি মোঘল নামে পরিচিত, তিনি বর্ণনা করেছেন, আমি ও মির্যা আইয়ুব বেগ সাহেব মৌলভী আব্দুল্লাহ্ টোংকীর বাড়ী গেলাম। মৌলভী আব্দুল্লাহ্কে মির্যা আইয়ুব বেগ সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি আমাদেরকে এবং আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে কাফির কেন বললেন? মৌলভী সাহেব অরিয়েন্টাল কলেজে আরবীর অধ্যাপক ছিলেন। কুফরী ফতওয়ায় তিনিও নিজের মোহর লাগিয়েছিলেন। মির্যা আইয়ুব বেগ সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, অমুক অমুক মৌলভী অর্থাৎ মৌলভী গোলাম দস্তগীর কুসূরী, মৌলভী মোহাম্মদ হুসেইন বাটালবী, মৌলভী নযির হোসেন দেহলবী, মৌলভী আব্দুল জব্বার গযনবী প্রমুখও ফতওয়া দিয়েছেন তাই আমিও লিখে দিয়েছি। মির্যা আইয়ুব বেগ সাহেব একান্ত সাহসিকতার সাথে বললেন, এরা সবাই জাহান্নামে গেলে আপনিও যাবেন? একথা শুনে তিনি বলেন, আমি ভুল করেছি। আমি মির্যা সাহেবের {হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর} বই পড়ে দেখি নি। একথা শুনে আমরা দু'জনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যে সমস্ত বই তখন পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল, সবগুলো মৌলভী সাহেবের বাড়ী গিয়ে দিয়ে আসলাম। আর বলে আসলাম, তিন মাসে এগুলো

পড়বেন। তিন মাস পর আমরা আবার মৌলভী সাহেবের কাছে গেলাম। মৌলভী সাহেব বললেন, তোমরা ছেলে মানুষ এখন তোমরা বুঝবে না! অর্থাৎ **তারা দু'জনই অল্প বয়সী যুবক ছিলেন**। মির্যা আইয়ুব বেগ সাহেব বললেন, আমি শিক্ষিত এবং বি.এ পাশ। আপনি যদি ইংরেজী পড়তে চান তাহলে আমি পড়াতে পারব। আমার যদি আরবী পড়তে হয় তবে আপনার কাছে পড়ে নিব। আমরা যদি আপনার দৃষ্টিতে অল্প বয়সী হয়ে থাকি তাহলে স্বল্পবয়সীদেরতো কোন হিসাব-নিকাস নেই। আপনি কি এমনটি লিখে দিতে পারবেন? এরপর আমরা সেখান থেকে চলে এলাম।

তারপর আমরা তৃতীয় বার সেখানে গেলাম খাজা কামাল উদ্দীন সাহেবের শ্বশুর খলীফা রজব উদ্দীন সাহেবকে সাথে নিয়ে। কারণ তিনি বৃদ্ধ ছিলেন। আমরা এই মনে করে তাকে নিয়ে গেলাম যে, মৌলভী সাহেব যদি আমাদের বলেন, তোমরা অবোধ বালক তাহলে আমরা খলীফা সাহেবকে সামনে উপস্থাপন করব। মৌলভী আব্দুল্লাহ্ সাহেব খলীফা রজব উদ্দীন সাহেবের সাথে কথা বলা আরম্ভ করলেন। (অর্থাৎ এদিক সেদিককার কথা বলতে শুরু করলেন) বলছিলেন যে, ভাল হয়েছে মুসলমানেরা আটা ও ডালের দোকান খুলেছে। মাটির হাড়ি-পাতিলের দোকান দিয়েছে। লিখেছেন, এটি পন্ডিত লেখলামের নিহত হবার পরের ঘটনা। একথা শুনে মির্যা আইয়ুব বেগ সাহেব মৌলভী আব্দুল্লাহ্র হাত ধরে বললেন, কিয়ামতের দিন এভাবেই আমি আল্লাহ্ তা'লার সম্মুখে মৌলভী আব্দুল্লাহ্র হাত ধরে বলব, হে আমার প্রভু! আমরা তিনবার তার বাড়ি গিয়েছিলাম কিন্তু তিনি আমাদেরকে বুঝিয়ে বলেননি— কেন আমরা কাফির। এ কথা শুনে মৌলভী আব্দুল্লাহ্ টোংকী বলেন, আমি এর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করি না।

তার এ কথার প্রেক্ষিতে আইয়ুব বেগ সাহেব বলেন, আপনি যদি আল্লাহ্ তা'লারই পরওয়া না করেন আমিও জীবনে আর কোন দিন আপনাকে সালাম করবো না। এরপর আমরা সেখান থেকে চলে আসি। মির্যা আইয়ুব বেগ সাহেব সারা জীবন এ অঙ্গীকারের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আর আমিও মৌলভী আবদুল্লাহ্র মৃত্যু পর্যন্ত এর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলাম।

নাম সর্বস্ব শিক্ষিত লোকদের এই গোঁয়ার্তুমি তখন থেকেই চলে আসছে এবং আজও চলছে। বই পড়ে না, আর পড়লেও পড়বে আংশিক এবং প্রসঙ্গ বিবেচনা না করেই বা লোক দেখা-দেখি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি আপত্তি করা শুরু করে। বরং আরব বিশ্ব হতে যেসব ঘটনা আসে তার অধিকাংশ ঘটনা এমনই হয়, পাকিস্তানের মৌলভীরা যেহেতু আহমদীদেরকে একযোগে কাফির ঘোষণা দিয়েছে কাজেই তারা কাফির; চিন্তা ভাবনার কিছু নেই। তাই আহমদীয়াতের প্রারম্ভেই যে ধারা চালু হয়েছে তা আজ অবধি চলছে।

হযরত মুন্সী কাজী মাহবুব আলম সাহেব বর্ণনা করেন, কয়েকদিন আমি স্কুলে যাই নি, চতুর্থ দিন আমি স্কুলে গেলে ডেস্কা'র মির্যা রহমত আলী সাহেব নামী এক ব্যক্তি যিনি আঞ্জুমান হেমায়েতে ইসলামে চাকুরী করতেন— তিনি কাছে ডেকে আমায় জিজ্ঞাসা করেন, গত চার দিন তুমি কোথায় ছিলে? আমি সরাসরি তাকে বলি, কাদিয়ান গিয়েছিলাম। তিনি বলেন, বয়আত করেছ? আমি বললাম হ্যাঁ। তিনি বলেন, একথা এখানে কাউকে বলো না, আমিও আহমদী এবং বয়আত করেছি কিন্তু এখানে মানুষের বিরক্ত করার আশংকায় আমি কারো কাছে কিছু বলি না। কিন্তু আমি তাঁকে বলি, আমি একথা গোপন রাখবো না। অতএব আমি কিলাওয়ালার মৌলভী গোলাম রসূলের ভাতিজা ও আমাদের কুরআন ও হাদীসের শিক্ষক মৌলভী জয়নুদ্দীন সাহেবকে জানিয়ে দেই যে, আমি আহমদী হয়ে গেছি। এ কারণে তিনি আমার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন আর ক্রমশঃ তিনি আমার প্রতি কঠোর ব্যবহার আরম্ভ করেন এমনকি তিনি বলতেন, যারা মির্যাকে মানে

তারা অন্য সকল নবীকে অস্বীকার করে। আর অধিকাংশ সময়ই তিনি আমাকে বলতেন, তওবা কর এবং বয়আত ভঙ্গ কর। কিন্তু সর্বদাই আমি তার সাথে পবিত্র কুরআনের আলোকে ঈসা (আ.)-এর জীবন-মৃত্যুর বিষয়ে কথা বলতাম, কিন্তু তিনি এর কোন উত্তর দিতেন না। বিরোধিতা এতোই বাড়িয়ে দেন যে, তার ক্লাশ শুরু হলেই তিনি আমাকে সম্বোধন করে বলতেন, মির্যায়ী! বেঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে যা। আমি তার নির্দেশ মত বেঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে যেতাম এবং জিজ্ঞেস করতাম, আমার অপরাধ কি? তিনি বলতেন, মির্যায়ী ও কাফির হওয়াই তোর যথেষ্ট অপরাধ। কিছু দিন আমি তার এ শাস্তি নিরবে সহ্য করি। পরে একদিন আমার মনে পড়ল, প্রিন্সিপাল সাহেব একজন নও মুসলিম এবং তাঁর নাম হাকিম আলী সাহেব, আমি কেন তাঁর নিকট অভিযোগ করি না? (যাহোক আমি তাঁকে বলি) কতক শিক্ষক আমাকে শুধু আহমদী হবার কারণে মারেন। এর ফলে, তিনি একটি নোটিশ জারী করেন, ধর্মীয় মতপার্থক্যের জন্য কোন শিক্ষক যেন কোন ছাত্রকে শাস্তি না দেয়। অতএব, এ আদেশ জারির পর মৌলভী জয়নুদ্দীন সাহেব ও তার সমমনা শিক্ষকরা নিয়ন্ত্রনে আসেন এবং আমার প্রতি যে কঠোর ব্যবহার করা হত তা কমে যায়।

এসব ঘটনা শত বছরের পুরনো কোন অজ্ঞ যুগের ঘটনা নয় বরং পাকিস্তানে এখনো এসবের পুনরাবৃত্তি ঘটছে। এখনো ছেলে মেয়েদের সাথে এমন আচরণ করা হয়। কিছুদিন পূর্বে আমার কাছে এক ছাত্রের চিঠি আসে তাতে লিখা ছিল, সে খুব ভাল নম্বর পেয়েছে ফলে কলেজে ভর্তির সুযোগ পায়। ভর্তি ফিস (টাকা) জমা দিতে গেলে কর্তৃপক্ষ এবং উপস্থিত কর্মকর্তারা, (কোন ভাবে তারা জানতে পেরেছে যে সে আহমদী) তাকে জিজ্ঞেস করে, তুমি কি আহমদী? সে বলল, হ্যাঁ আমি আহমদী। তারা বলল, এই নাও তোমার টাকা– তোমার ভর্তি বাতিল, তোমাকে যেন আর এখানে না দেখি। তোমাকে এখানে দেখা গেলে পা ভেঙ্গে দিব।

একইভাবে কয়েকদিন পূর্বে একটি মেয়ে চিঠি লিখেছিল, সে অনেক ভাল নাম্বার নিয়ে পাশ করেছে, পড়াশুনায় মেধাবী কিন্তু বোর্ড পরীক্ষার তারা কম্পিউটারাইজড নতুন যে ভর্তি ফর্ম বানিয়েছিল তাতে মুসলিম কি অমুসলিম লেখা বক্সের কোন একটিতে টিক দিতে হয়। পূর্বে আমাদের ছেলে-মেয়েরা আহমদী লিখে দিত। কিন্তু এখন আর সে সুযোগ নেই। এই মেয়ে বলে, যেহেতু আপনি বলেছিলেন মুসলমান লিখবে তাই দু'তিন বার আমি মুসলমান লেখা বক্সে টিক চিহ্ন দিয়েছি। সেই মেয়ে লিখেছে, ডিকলারেশন ফর্মে মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে গালি দিয়ে স্বাক্ষর করতে বলা হয়। সেখানে যদি আমরা স্বাক্ষর না করি তাহলে ভর্তি বাতিল হয়ে যায়। অতএব স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের প্রতি এমন কঠোর আচরণ করা হচ্ছে। মেধাবী ছাত্রদের প্রতি এমন ব্যবহার আজও অব্যহত আছে। উপরে বর্ণীত ঘটনায় প্রিন্সিপাল সাহেব ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। তিনি কিছু ন্যায় নীতি অবলম্বন করেছেন ফলে এ কঠোরতা বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু বর্তমানে রাষ্ট্রীয় আইনের অধীনে এই ন্যায়-নীতি বিবর্জিত ব্যবহার করা হচ্ছে আর সীমালঙ্ঘন করা হচ্ছে এবং আরও অনেক ছেলেমেয়ে এভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। যাহোক অত্যাচার হচ্ছে আর অত্যাচারের পাশাপাশি আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে তাদের ঈমান দৃঢ়তর হচ্ছে।

একইভাবে হযরত মেহের গোলাম হাসান সাহেব বর্ণনা করেন, আমি এবং মৌলভী ফয়েজউদ্দীন সাহেব বসা ছিলাম, রহীম বখ্শ নামে দর্জী পেশার এক ব্যক্তি এখানে আসেন। এসে বলেন, মৌলভী সাহেব! আজ আমি খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। কারণ জিজ্ঞাসা করলাম, তখন তিনি বলা আরম্ভ করলেন, হামেদ সাহেব একজন ফিরিশ্তা তুল্য ভাল মানুষ। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সবাই তার প্রশংসা করে। আজ তার দ্বারা একটি বড় অন্যায় হয়ে গেছে। সে তার মামা উমর শাহ্

সাহেবকে বললেন! মামু জান! আপনি হযরত ইবনে মরিয়ম সম্পর্কে কী ধারণা পোষণ করেন? তিনি বলেন, বাবা! আমার বিশ্বাস হল, তিনি আকাশে জীবিত আছেন, কোন এক যুগে তিনি উম্মতে মুহম্মদীয়ার সংশোধনকল্পে আগমন করবেন। শাহ্ সাহেব বললেন, মামা! আজ থেকে আপনি আমার ইমাম হতে পারেন না। কেননা এক মানবকে চিরস্থায়ী-চিরঞ্জীব এবং অবিনশ্বর মনে করা অংশীবাদিতার নামান্তর। দ্বিতীয় কথা হল, এই বিশ্বাস পোষণ করলে আমাদের নেতা ও মনিব হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অপমান হয়। তিনি মাটিতে কবরস্থ থাকবেন আর হযরত ঈসা (আ.)-কে আকাশে উঠানো হবে! এ কথার পর উমর শাহ্ সাহেব বললেন, আচ্ছা বাবা! তুমি সামনে দাঁড়াও আমি তোমার পিছনে নামায পড়ব। তিনি বলেন, তার কথা শোনামাত্র আমি বললাম, মৌলভী সাহেব! ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুতে আমি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। যদি ঈসা (আ.) জীবিত থাকেন তাহলে একেশ্বরবাদের উপর অনেক বড় আঘাত আসে। আপনি এটি মনে করবেন না যে, আমি একজন আহমদী। আমি এখনও আহমদী হই নি কিন্তু মির্যা সাহেবের এ কথা অবশ্যই সত্য। মহানবী (সা.)-এর অপমান হয় এমন কথা আমি কোন ভাবে সহ্য করতে পারি না। মৌলভী সাহেব আমার মুখে হাত চাপা দিলেন। আমি বললাম, মৌলভী সাহেব! বাধা দিচ্ছেন কেন? মৌলভী সাহেব বললেন, এটি যদি আপনার বিশ্বাসও হয়ে থাকে যে, ঈসা (আ.) মারা গেছেন তাহলেও এত বাড়াবাড়ির প্রয়োজন কী? ঠিক আছে, আপনি যদি এটা ঠিক মনে করেন তবে ঠিক আছে কিন্তু শান্ত হোন। আমি বললাম, মৌলভী সাহেব! মসজিদ থেকে বের হয়েই আমি ঘোষণা দেবো, মানুষকে বলবো যে, হযরত ঈসা (আ.) আকাশে থাকলে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অসম্মান হয়। এই বিশ্বাস আমার জন্য প্রানান্ড়কর। আমি গিয়েই আমার পিতাকে বুঝালাম এবং আমার বড় ভাই গোলাম হোসেন সাহেবকেও যিনি আরেফ ওয়ালা জামাতের আমীর। তিনি সে সময় আহমদী ছিলেন না; দু'জনই আমার কথা শুনে রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেলেন। আর আমাকে দাজ্জাল, অভিশপ্ত ইত্যাদি আখ্যা দিলেন। তিনি বলেন, আমার মনে হলো, আগামীকাল মৌলভীরা আমার উপর আক্রমন করবে। আমি একজন ভৃত্যের মারেফত সেই আহমদীকে ডাকালাম যাকে রাতে মসজিদে যেতে বাধা দিয়েছিলাম। (তখনও তিনি আহমদী হন নি কিন্তু নিজের বিশ্বাসের কথা বর্ণনা করছেন) বলেন, মনে হলো এখন আমার পিতা-মাতা এবং ভাইয়ের বকাও খেতে হবে। মৌলভীরা আমার পিছনেও লাগবে। এ কারণে আমি সেই আহমদীকে ডেকেছি যাকে আমরা মসজিদ থেকে বের করে দিয়েছিলাম। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, মির্যা সাহেব কি ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর কোন প্রমাণ দিয়েছেন নাকি এমনিতেই দাবী করে বসেছেন? তিনি বলেন, ত্রিশটি আয়াত উপস্থাপন করেছেন। আমি বিস্ময়াভিভূত হয়ে বললাম, আমরা দিবারাত্র কুরআন পড়ি অথচ আমরা জানি না, ব্যাপার কি। একটি আয়াতই আমাদের বলুন? তিনি সপ্তম পারার **'ফালাম্মা তাওয়াফ্ফায়তানী'**, আয়াত উপস্থাপন করলেন। আমি বললাম, আমি বুঝে গেছি। এখন কোন মৌলভী আমার মোকাবিলা করতে পারবে না। ফজরের সময় মৌলভী গোলাম হোসেন সাহেব এবং মৌলভী ফয়েজ দ্বীন সাহেব এবং আরো দু'তিন জন আমার ভাইয়ের সাথে আসলো। আমি মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। ততক্ষণে তারা এসে পৌঁছালো। মৌলভী গোলাম হোসেন বলল, আপনি কেন মসীহ্র শত্রু হয়ে গেলেন? আমি বললাম, মৌলভী সাহেব কি শত্রুতা করেছি? সে বলতে লাগলো আপনার ভাই বলল, সে ঈসার মৃত্যুতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। অর্থাৎ তার ভাই এটি অভিযোগ করেছিল। তখন আমি বললাম, মৌলভী সাহেব! কি করবো তিনি নিজেই স্বীয় মৃত্যুর কথা স্বীকার করছেন। সাক্ষী সরব আর বাদী নিরব এ হলো আপনার অবস্থা। মৌলভী সাহেব বলল,

কোথায় লিখা আছে, ঈসা স্বয়ং তার মৃত্যুর স্বীকারোক্তি দিয়েছেন। আমি বললাম কুরআনে। সে বলতে লাগলো কোন কুরআন যা মির্যা সাহেব বানিয়েছেন? আমি বললাম মৌলভী সাহেব একটু সাবধানে কথা বলুন। খোদার সাথে লড়াই করছেন। কেননা আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমার কুরআনের মত গ্রন্থ কেউ বানাতে পারবে না আর আপনি বলছেন, মির্যা সাহেব কুরআন বানিয়েছেন। কিছুটা হলেও বিবেক খাটান। বললো, কোথায় লিখা আছে? আমি সপ্তম পারার আয়াত পড়লাম। বলতে লাগলো, আমরা তোমাকে একটি নিগুঢ় তত্ত্ব বাতলে দেই তাহলো এই বেঈমান অর্থাৎ আহমদীদের সাথে কথা বলবে না। আর তাহলেই তুমি রক্ষা পেতে পার অন্য আর কোন উপায় নাই। বরং চোখে চোখও মিলাবে না। যদি চোখে চোখ মিলাও তাহলেও প্রভাব পড়বে। এ দু'টি রহস্য যদি স্মরণ রাখ তাহলেই বাঁচতে পারবে। বলেন, আমি বললাম মৌলভী সাহেব! সত্যের প্রভাব এমনই হয়ে থাকে। এই যে আপনি আমাকে পদ্ধতি বলছেন এটিও সত্যের নিদর্শন। মৌলভী সাহেব ফেরত চলে গেলেন। আমার বিরোধী ভাই নাইরোবী চলে গেল। আমি বয়আত গ্রহণ করি আর পিতা এবং স্ত্রীকেও বুঝাতে সক্ষম হই। মোটকথা সকলকেই বুঝাই। ভাই নাইরোবী গিয়ে বুঝেছেন। তিনি দশ মাস পর ফিরে এসেই বয়আত করেন। এখন খোদার কৃপায় (যখন এ ঘটনা লিখছেন তখন লিখেন) আমাদের পাড়ায় একশ' দেড়শ' আহমদী বসবাস করেন।

আজও মানুষকে বলা হয় এদের সাথে কথা বলো না, এদের চোখে চোখ মিলিও না। আর এটি শুধু আজকের কথা নয়। আজ থেকে চৌদ্দশ' বছর পূর্বেও একই কথা বলা হতো যখন হযরত মুহাম্মদ (সা.) দাবী করেছেন। তোফায়েল বিন আমর দোসীর সেই বিখ্যাত ঘটনা আপনারা জানেন। তিনি বলেন, আমি মক্কায় এসেছি, কুরায়শরা বললো, তুমি একজন সম্মানিত নেতা এবং বিচক্ষণ কবি, আমাদের দেশে এসেছো। তোমাকে বলতে চাই, আমাদের এখানে একজন নবী হবার দাবী করেছে। আর আমাদেরকে খন্ডবিখন্ড ও বিভক্ত করে দিয়েছে। তার কথায় যাদু আছে। যারফলে পিতা হতে পুত্র, ভাই হতে ভাই এবং স্বামী হতে স্ত্রী বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আপনি ও আপনার জাতি যদি তাদের কথা মেনে নেন তবে আমরা আশঙ্কা করি কোথাও আপনাদের দশা তা না হয়ে যায় যা আজ আমাদের হয়েছে। কাজেই ঐ ব্যক্তির সাথে কথা বলবেন না এবং তাঁর কথাও শুনবেন না। তিনি বলেন, তারা অর্থাৎ কাফিররা এত জোর দিয়ে বলায় আমি তাঁর কথা শুনবোনা বলে সিদ্ধান্ত নিলাম। এমনকি আমি যখন খানা কাবায় গেলাম তখন এ ভয়ে কানে তুলো পুরে দিলাম যেন তাঁর (সা.)-এর কোন কথা আমার কানে প্রবেশ করতে না পারে। মহানবী (সা.) খানা কাবাতে নামায পড়ায় মগ্ন ছিলেন। আমি তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে পড়লাম। তবে খোদা তা'লার নিয়তি তিনি (সা.)-এর কিছু কথা আমাকে শুনিয়েই ছাড়ল যা আমার ভালো লাগলো। আমি মনে মনে নিজেকে সম্বোধন করলাম, তোমার কি হয়েছে? তুমি একজন বিচক্ষণ মানুষ, বুদ্ধিমান ব্যক্তি, কবি, ভালো মন্দের পার্থক্য করতে জান। এই ব্যক্তির কথা শোনা উচিত, ভালো হলে মেনে নিও আর মন্দ হলে বিরত থেকো। তিনি বলেন, যাহোক আমি সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। তিনি (সা.) নামায পড়া শেষ করে ঘরের দিকে রওয়ানা হলেন। আমি তাঁর (সা.)-এর পিছু পিছু চলতে থাকলাম। হুযূর যখন ঘরে পৌঁছলেন তখন আমি তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে বললাম, হে মুহাম্মদ (সা.) আপনার জাতি আপনার সম্পর্কে আমাকে এই কথা বলেছে। আর আমাকে এমন ভাবে ভয় দেখিয়েছে যে, আমি আমার কানে তুলো ঢুকিয়ে দিয়েছি যেন আপনার কোন কথা আমার কানে না যায়। কিন্তু খোদার নিয়তি আমাকে আপনার কিছু কথা শুনিয়ে দিয়েছে আর তা আমার ভালো লেগেছে। এখন আমি আপনার কথা আরো শুনতে চাই। যার ফলে তিনি (সা.) তাকে ইসলাম সম্পর্কে অবহিত করলেন এবং

কুরআন শুনালেন। তিনি বলেন, খোদার কসম! এর চাইতে সুন্দর বাণী ও সঠিক কথা আমি পূর্বে কখনো শুনিনি। অতএব তিনি কলেমা পাঠ করে ইসলাম গ্রহণ করেন।

এ হলো বিরুদ্ধবাদীদের চিরাচরিত আচরণ। যাদু করা হলে তা বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে করা হয়, নবীদের পক্ষ থেকে নয়। আল্লাহ্ তা'লা এ প্রমাণই দিয়েছেন, যাদু কখনো সফল হয় না। তাদের দৃষ্টিতে এ যাদু যদি সফল হয়ে থাকে তাহলে কুরআনের প্রমাণ অনুযায়ী তা যাদু নয় বরং সত্য; আর এটি তাদের গ্রহণ করে নেয়া উচিত।

অনুরূপভাবে জম্মু নিবাসী খলীফা নূরুদ্দীন সাহেব (রা.) লিখেন, আমি এক বছর ধরে মৌলভী আব্দুল ওয়াহেদ গজনবী সাহেবকে বুঝাচ্ছিলাম। একবার তিনি বলেন, আলেমগণ মির্যা সাহেবের বিরুদ্ধে কুফরী ফতওয়া দিয়েছে। আমি বললাম, তোমার পিতার বিরুদ্ধেও উলামারা কাফির ফতওয়া দিয়েছে। এরপর তিনি খুব সম্ভব মৌলভী মোহাম্মাদ লাক্ষুকের সম্বন্ধে বলেন, তার উপরও ইলহাম হয়। তাকে লিখে জিজ্ঞেস করে নেই মির্যা সাহেবের দাবী সম্পর্কে খোদা তা'লা কি বলেন? একমাস পর মৌলভী সাহেবের উত্তর এলো, আমি দোয়া করেছি আর খোদার পক্ষ হতে উত্তর এসেছে মির্যা সাহেব কাফির। আমি কোন কাজে 'বাদরাওয়াহ্' গিয়েছিলাম। জম্মুতে ফিরে এলে তিনি আমাকে এ চিঠি দেখান। আমি বললাম, ইলহামকারী খোদা নাউযুবিল্লাহ্ বড়ই ভীতু; যে মির্যা সাহেবকে কাফিরও বলে আবার সাহেব বলেও সম্বোধন করে।

তিনি (রা.) এ বিষয়টি উপস্থাপন করেন যে, (ইলহাম করতে গিয়ে) মির্যা সাহেব বলে সম্বোধন করছেন। একদিকে আল্লাহ্ বলছেন কাফির আর অপরদিকে সাহেব বলে সম্বোধন করছেন যা সম্মানের জন্য ব্যবহৃত হয়। এমন ভীতু খোদার উপর নির্ভর কীভাবে করা যেতে পারে? তিনি (রা.) বা সাহাবারা ছোট ছোট কথা থেকে এরূপ তত্ত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা উপস্থাপন করতেন।

দিল্লীর হাকিম আব্দুল গনী সাহেবের পুত্র হাকীম আব্দুস সামাদ খাঁন লিখেন যে তিনি ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বয়আত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন, আমি ১৮৯১ সালে এক মৌলভী সাহেবের কাছে জালালাইন পড়তাম। يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ আয়াত আসে যার তফসীরে লিখা ছিল, **'রাফেউকা ইলায়্যা মিনাদ্ দুনিয়া মিন গায়রে মওত'**। আমি অবাক হলাম, **'মিন গায়রে মওত'** কোত্থেকে আসল। এটি কি আয়াতের মূল অংশ বা মাতান এর তফসীর হচ্ছে নাকি মাতান এর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে? চিন্তা করতে করতে রাত দু'টো বেজে গেল। কোন কারণে আমার পিতার ঘুম ভেঙ্গে যায়। তিনি এতরাত পর্যন্ত জেগে থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। আমি সব কথা খুলে বললাম। সব শুনে তিনি বললেন, মিয়া ওস্তাদ কিসের জন্য? তুমি সকালে মৌলভী সাহেবের কাছে এ সমস্যা সমাধান করে নিও। সে মোতাবেক পরদিন সকালে আমি মৌলভী সাহেবের কাছে গেলাম এবং সব কিছু খুলে বললাম। মৌলভী সাহেব বললেন, পূর্বাপর সবার বিশ্বাস এটিই। এ নিয়ে বিতন্ডা কর না। শুরু থেকেই বিষয়টা এভাবে চলে আসছে। এ চিন্তা বাদ দাও। কিন্তু আমি বললাম, যতক্ষণ পর্যন্ত বিষয়টি আমার বোধগম্য না হয়, আমি কিছুতেই আগাতে পারব না, এতে মৌলভী সাহেব অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। আমার পিতাকেও ডেকে পাঠালেন। কিন্তু তিনি (পিতা) বললেন, আপনি শিক্ষক আর এ ছাত্র। আমি তাকে আপনার কাছে পড়তে পাঠিয়েছি। আপনি আপনার বিষয় ভাল বোঝেন, আমি এতে নাক গলাব না। এই বলে আমার পিতা উঠে চলে গেলেন। মৌলভী সাহেব আমাকে পুনরায় বলতে লাগলেন, পড়। আমি বললাম, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে এটি না বোঝাবেন আমি কীভাবে পড়ব? এতে মৌলভী সাহেব রাগান্বিত হলেন। তিনি আমাকে থাপ্পড় মেরে বললেন, তুইও পাগল হয়েছিস আর মির্যাও। শুনে আমি অবাক হলাম, এই মির্যা আবার কে?

(অর্থাৎ তিনি মির্যা সাহেবকে চিনতেন না এবং তার দাবী সম্পর্কেও অবহিত ছিলেন না) সাথে সাথে আমার মনে এ ধারণা জাগ্রত হল যে, আমি কোন দৃঢ় বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত আছি, এটা কেবল আমার ধারণাই নয় বরং এর কোন ভিত্তি রয়েছে যা আমার হৃদয়ে জাগ্রত। আরও লোক রয়েছে যিনি এ ধারণা রাখেন। বুঝলাম যে, আমি অযথা সময় নষ্ট করিনি এরপর আমি মৌলভী সাহেবকে বললাম, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আমাকে এটি না বুঝাবেন আমি আর সামনে অগ্রসর হব না। এটি ইসলাম ধর্ম এবং এতে জোর জবরদস্তি বৈধ নয়। আজ আপনি আমাকে থাপ্পর মেরে নিজের ধর্ম চাপাবেন, কাল অন্য কোন মৌলভী সাহেব দুই থাপ্পর মেরে এর বিপরীত কথা বলাবে। আর পরশু কেউ তিন থাপ্পড় মেরে ভিন্ন কথা বলাবে। এটি কোন ধরনের তামাসা? আমি কিছুতেই পড়ব না। এ থেকে বুঝা যায়, পুরনো লোকেরা এমনিই সব কিছু মেনে নিতেন না। তারা বিষয়ের খুব গভীরে যেতেন।

তিনি বলেন, এ ঝগড়ায় এগারটা বেজে গেল। কিন্তু আমি কিছুতেই পড়ছিলাম না। সন্ধ্যায় অপর শিক্ষকের কাছে গেলাম। তিনিও বললেন, মির্যার মত তোমাকেও পাগলামিতে পেয়েছে। তিনি একই কথা পুনরায় বললেন, এক তোমার মাথা খারাপ হয়েছে আরেক ব্যক্তি হল, মির্যা অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কথা বললো। তিনি বলেন, এতে আমার মন আরও দৃঢ় হল যে, আমার ধারণা দুর্বল নয়। এরপর তৃতীয় শিক্ষক মৌলভী আব্দুল ওয়াহ্হাব এর কাছে গেলাম। তিনি বললেন, এটাতো অনেক বড় কাহিনী। এর দাবীকারক একজন আছে– যে বলে হযরত ঈসা মারা গেছেন। আর মানুষ যে ঈসার আগমনের অপেক্ষা করছে, সে ব্যক্তি আমি। আমি বললাম, প্রথম বিষয়টি আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু দ্বিতীয়টি এখনো বুঝতে পারি নি। তিনি বললেন, আমি পাঞ্জাবে গিয়েছিলাম। সেখানে বাইশ দিন অবস্থান করি। তার এক জন শিষ্য মৌলানা নূর উদ্দীন। জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় সে অদ্বিতীয়। আমি তাঁর ধর্মীয় দরসও শুনেছি। বড় বড় মৌলভী তাঁর সামনে টু শব্দটি করতে পারে না । তিনি তাঁর নিজের বয়আতের কথা এই যুবকের সামনে স্বীকার করলেন না কেননা তিনি বিরোধিতাকে ভয় করতেন। (অথচ এই মৌলভী সাহেব বয়আত করে এসেছিলেন।)

আমাকে বলতে লাগলেন, উচ্চস্বরে কথা বলবে না। মৌলভী আব্দুল গফুর সাহেব জেনে যাবেন। অন্য কোন গয়ের আহমদী মৌলভী সেখানে বসা ছিলেন। আমি বললাম, আমি এর প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ করি না। আমি সত্যের প্রকাশ থেকে কীভাবে বিরত থাকতে পারি? এভাবে পড়তে পড়তে ১৯০৫ সাল এসে গেল। বলছেন, আমি পড়াশুনা অব্যাহত রাখি, ইতিমধ্যে ১৯০৫ সাল চলে আসে। হযরত সাহেব দিল্লিতে আসেন। আর সিয়াহী ওয়ালার আলিফ খাঁন সাহেবের বিশাল ভবনে অবস্থান করেন। হাজার হাজার লোক তাঁকে দেখার জন্য আসে। আমিও বিরুদ্ধবাদী মৌলভীদের সাথে আসি। এতে ছাত্র বেশি ছিল আর আমাদের নেতা ছিলেন মৌলভী মুশতাক আলী। তিনি হযরত সাহেবের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আপত্তি উত্থাপন করা আরম্ভ করে। হুযূর বলেন, আপনি অপেক্ষা করুন। আর হযরত মুফতি মুহাম্মদ সাদেক সাহেবের নিকট থেকে কাগজ, কলম ও কালি নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেন আর সেটি মৌলভী মুশতাক আলী সাহেবকে দিয়ে বলেন এটি আপনি পড়ে শুনান। কোন শব্দ না বুঝলে আমার কাছ থেকে জিজ্ঞেস করে নিন, আর এর উত্তরও প্রস্তুত করুন। (অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সেখানে বসেই একটা ছোট্ট প্রবন্ধ লিখেন। সেটি ঐ গয়ের আহমদী মৌলভীকে পড়ার জন্য দেন। আর বলেন, না বুঝলে আমাকে জিজ্ঞেস করে নিন। আর আমি যে প্রবন্ধ লিখেছি এর উত্তর লিখুন।) তিনি বলেন, প্রথমে আপনি আমার প্রবন্ধ পড়ে শুনান

এরপর আপনার লিখিত খন্ডন শুনিয়ে দিন। তখন মৌলভী সাহেব উত্তর না লিখেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রবন্ধ পড়ে শোনাতে আরম্ভ করেন। হযরত সাহেব আবার বললেন, আপনি যদি উত্তর লিখতেন তাহলে ভাল হতো। নিজে এর উত্তর লিখে নিলে সময় নষ্ট হতো না। কিন্তু তিনি বললেন, প্রয়োজন নেই এ বলে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রবন্ধ পাঠ করা আরম্ভ করেন আর বলেন, আমি মৌখীক উত্তর দিব। আমার উত্তর লিখার প্রয়োজন নেই। যাহোক তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রবন্ধ পড়ে শুনিয়ে দেন। শুনানোর পর তিনি দীর্ঘক্ষণ চুপ থাকেন। উত্তর দিতে পারেন নি। সঙ্গে আসা ছাত্রদের অনেকে বললো, আমরা যদি জানতাম আপনি উত্তর দিতে পারবেন না, তাহলে আমরা অন্য কাউকে নেতা হিসেবে নিয়ে আসতাম। আপনি আমাদেরকে লজ্জিত করেছেন। এতে মৌলভী সাহেব এক ছাত্রকে থাপ্পর মারেন। উত্তর দিতে পারেন নি কিন্তু রাগে চড় মারলেন। সেও মৌলভী সাহেবকে চড় মারলো। এতে তিনি আরও মারলেন। আমাদের মুফতি সাদেক সাহেব উভয়কে ঝগড়া হতে নিবৃত্ত করেন। এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বক্তৃতা শুরু করেন। আর হুযূরের বক্তৃতার সময় মানুষ কিছুটা হট্টগোল করে। জামাতের লোকেরা হুযূরের চারপাশ ঘিরে অবস্থান নেয়। কিছুটা জায়গা খালি ছিল, আমি সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে যাই। তিনি তখনও আহমদী হননি। আকবর খাঁন নামী একজন আহমদী চাপরাশি ছিলেন। তিনি আমাকে বিরোধী মনে করে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেন। কিছুক্ষণ পর আমি আবার সেখানে গিয়ে দাঁড়াই। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি হৃদয়ে কিছুটা ভালবাসা সৃষ্টি হয়েছিল এজন্য খালি জায়গা দেখে তিনি ডিউটি দেয়ার জন্য সেখানে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। যাতে কেউ কোন ক্ষতি না করতে পারে। তিনি বলেন, তিনি আমাকে ধাক্কা দেন। তিনি দ্বিতীয়বার যখন আমাকে ধাক্কা দেয়ার জন্য সামনে আসেন তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল নূর উদ্দীন (রা.) তাকে বাধা দেন। বলেন, তাকে কেন ধাক্কা দিচ্ছো? আকবর খাঁন সাহেব বলেন, হুযূর এ বিরোধী। মৌলভী সাহেব বললেন, তুমি কি তার হৃদয় চিরে দেখেছ? যে আসতে চায় তাকে আসতে দাও। এরপর মৌলভী চামড়িয়াঁ ওয়ালা দাঁড়িয়ে যায় (মৌলভীদের এমনও নাম হয়ে থাকে) সে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কে কিছু বাজে মন্তব্য করে। আমি বললাম, এই চামড়িয়াঁ ওয়ালা! বেশি কথা বলবে তো তোমার জিহ্বা টেনে ছিড়ে ফেলব। এই কথা শুনে হযরত হাফিয আব্দুল মজিদ তাকে নিষেধ করেন, এখন আমাদের নিজেদের সৈনিকরাই বিদ্রোহী হয়ে উঠছে। এই সময় চুপ থাক আর ভদ্রতার সীমা ছাড়িও না কেননা আপনজনই এখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে তাদের হাতেই আমরা মার খাবো তাই মুখ বন্ধ রাখ।

তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর বক্তৃতায় বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে মসীহ্ মওউদ হিসেবে প্রেরণ করেছেন আর বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের জ্ঞানের অভাবে আমার সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে না সে যেন সেই দোয়া মনোযোগের সাথে পড়ে যা আল্লাহ্ তা'লা তাকে পাঁচ বেলার নামাযে পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন অর্থাৎ, اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে সর্বদা অজস্র ধারায় পাঠ কর। চল্লিশ দিন পর্যন্ত যদি পবিত্র নিয়্যতের সাথে অজস্র ধারায় এ দোয়া পাঠ করে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তাদের সামনে সত্য প্রকাশ করে দিবেন।

তিনি বলেন, আমি সেই সময় থেকেই শুরু করে দিয়েছি। সপ্তাহ অতিক্রান্ত না হতেই আমার সামনে সত্য প্রকাশ পেয়ে যায়। আমি স্বপ্নে দেখেছি, হামেদ কে পাড়ার মসজিদে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শুভাগমন হয়েছে। আমি স্বপ্নে হযরত সাহেবের দিকে করমর্দনের জন্য

এগিয়ে যেতে চাচ্ছি কিন্তু এক অন্ধ মৌলভী আমাকে বাধা দেয়, অন্য দিক থেকে আবার এগিয়ে যেতে চাইলাম সেদিক থেকেও সে বাধা দেয়, আবার তৃতীয়বার যখন এগিয়ে গিয়ে করমর্দন করতে চাইলাম তখন আবার সে আমাকে বাধা দেয়। তখন আমার রাগ ধরে আর আমি তাকে আক্রমণ করার জন্য হাত উঠাই। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) স্বপ্নের মধ্যেই আমাকে বলছেন রাগ কর না, মেরো না। আমি নিবেদন করলাম, হুযূর! আমি হুযূরের সাথে করমর্দন করতে চাই আর সে আমাকে বাধা দিচ্ছে। ইতোমধ্যে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়।

আমি সকালে মীর কাশেম আলী সাহেব এবং মৌলভী মাহবুব আহমদ এবং মিস্ত্রী কাদের বক্সের সামনে এই ঘটনা উল্লেখ করি। মীর সাহেব বলেন, এটি লিখে দাও, আমি লিখে দেই। তিনি বলেন, নীচে লিখে দাও যে, আমি আমার এই স্বপ্নকে হুযূরের হাতে বয়আতের কারণ হিসেবে উপস্থাপন করছি। আমি তা লিখে দিয়েছি। মৌলভী মাহবুব আহমদ সাহেব যিনি অ-আহমদী ছিলেন তিনি বলেন, তোমার পিতার মেজাজ সম্পর্কেও তুমি সবিশেষ অবহিত আছ। তিনি এক মুহূর্তের জন্যও তোমাকে নিজের ঘরে থাকতে দিবেন না। আমি বললাম, আমি পরওয়া করি না। যাহোক হযরত সাহেব আমার বয়আত গ্রহণ করেন আর আমাকে লিখেন, তোমার বয়আত গ্রহণ করা হয়েছে। যদি তোমাকে পাহাড় পরিমাণও গালি দেয়া হয় তবুও তুমি ভ্রুক্ষেপ করবে না, যত ইচ্ছে গালি দিক তুমি কোন উত্তর দিবে না।

তিনি আবার বলেন, আমি মুল কাহিনীর দিকে আসছি, হযরত সাহেবের বক্তৃতার পর হযরত মৌলনা নুর উদ্দীন খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁর বক্তৃতার শেষে আমি তাঁর সাথে করমর্দন করি। মৌলভী সাহেব বলেন, মিয়াঁ তুমি ধর্মীয় বিষয়ে কিছু পড়েছ কি? আমি বললাম, হুযূর মিশকাত এবং জালালাঈন পড়েছি। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, ফিকাহ্ কতটুকু পড়েছ? আমি বললাম কদুরী এবং অপর একটি নাম আছে (সঠিকভাবে পড়া যাচ্ছে না) তা পড়েছি। এ ঘটনাগুলো সবই হাতে লেখা হয়েছে, এজন্যই পড়া যাচ্ছে না। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, যুক্তিবিদ্যা কতটুকু পড়েছ? আমি বললাম ছোট ছোট পুস্তিকা পড়েছি। অতঃপর আমি হযরত সাহেবের সাথে করমর্দন করেছি আর যখন ফিরে এলাম, মৌলভী আব্দুল হাকীম সাহেব বলেন, তুমি তোমার হাত মুচীর ছুরি দিয়ে ছিলিয়ে ফেল, এক ধরনের অস্ত্রের কথা বলল যদ্বারা চামড়া ছেলা হয় যা মুচী বা জুতা প্রস্তুতকারীরা ব্যবহার করে থাকেন। বলেন, তুমি যেহেতু মির্যা সাহেবের সাথে করমর্দন করেছ তাই তুমি যদি হাতের চামড়া ছিলে ফেল তাহলেই তোমার হাত পরিস্কার হবে তা ছাড়া নয়। কেননা সেই হাতে তুমি মির্যা সাহেবের সাথে করমর্দন করেছ (নাউযুবিল্লাহ)। যাহোক ইনি বয়আত করে এসেছেন।

একইভাবে হযরত হাফিয গোলাম রসূল সাহেব উযিরাবাদী একটি ঘটনা লিখেন। তিনি বলেন, উযিরাবাদের উত্তরে সমনরাজগানে অবস্থিত একটি বিশাল ভবনে কাশ্মিরের রাজুরী অঞ্চলের মুসলমান রাজা থাকেন। এক ব্যক্তি আল্লাহ্ ওয়ালা, কাবুলের দূত রাজা আতা আল্লাহ্ খাঁন সাহেব মরহুমকে গিয়ে বললেন, মানুষ অনর্থক গোলাম রসূলের পিছে লেগেছে। রাজা সাহেব বলেন, এতে অসুবিধা কি (তিনি আহমদী হয়ে গিয়েছিলেন) তিনি বলেন হাফিয সাহেবকে নিয়ে আস। এখানে এসে বলে দিক যে কুরআনে, মসীহ্র 'রাফা'র যেভাবে উল্লেখ আছে আমরা সেভাবে বিশ্বাস করি একইভাবে 'নযূলে মসীহ্' বা ঈসার অবতরণের কথা যা হাদীসে এসেছে তাও বলে দিক।

অতএব শহরে এ সম্পর্কে ঘোষণা করে দেয়া হয়েছে আর মুসলমানদের সমস্ত ফির্কার হাজারো মানুষ সমবেত হয়েছে। আমার যা বলার ছিল আমি তা জানতাম। আর এটিও জানতাম যে, আমার কথা কেউ বুঝতে পারবে না। ইঙ্গিতে কথা বলব। শুধুমাত্র আমার বংশের হাকীম সুলতান আলী নামে এক ব্যক্তি আছে, যদি কেউ বুঝে থাকে তাহলে কেবল সে-ই বুঝবে। মোটকথা আমি যখন পৌঁছলাম তখন রাজা সাহেব বললেন, জনাব আল্লাহ্ ওয়ালা বলেছেন, হাফিয সাহেব মসীহ্‌র 'রাফা' এবং 'নুযূল' বিশ্বাস করেন এটি কি সত্য? আমি বললাম, নিঃসন্দেহে। মানুষ কথা বলা বন্ধ করলেই আমি বলে দিচ্ছি। হাজারো শ্রোতার সমাবেশে তিনি একমাত্র আহমদী ছিলেন। যখন সবাই নিরব হয়ে গেল, সেই সময় আমি বললাম, শুনুন বন্ধুগণ! যেহেতু পবিত্র কুরআনে মসীহ্‌র জন্য 'রাফা' শব্দ এসেছে আর একইভাবে হাদীস শরীফে 'নুযূলে'র উল্লেখ রয়েছে তাই আমি এটিকে সত্য মনে করি; যে এটি মানে না আমি তাকে বেঈমান জ্ঞান করি। এতটুকু বলার পরই শ্রোতাদের মধ্য থেকে প্রশংসাবাক্য, মুবারকবাদ মুবারকবাদ শব্দ উচ্চস্বরে ধ্বনিত হওয়া আরম্ভ হয়, হৈ-হুল্লোড় শুরু হয়ে যায়। আমি সেই সময় দ্রুত মজলিস থেকে বের হয়ে যাওয়া নিরাপদ মনে করলাম আর বেরিয়ে গেলাম।

কিন্তু আমার চলে আসার পর সেই ব্যক্তি হাকীম সুলতান আলী আমার ধারণা অনুযায়ী রাজা সাহেবকে বলে দিলেন, তোমরা কোন কিছুই বুঝতে পারো নি। সে তোমাদের চোঁখে ধুলো দিয়ে চলে গেছে। তাকে আবার ডাক। সমন (সমনরাজগান) দরজা দিয়ে বের হতেই কিছু লোক আমাকে আবার নিয়ে যাওয়ার জন্য আমার সন্ধানে আসে। কিন্তু আমি অন্য কোন রাস্তা দিয়ে বের হয়ে ঘরে পৌঁছে যাই। রাত নিরাপদেই কেটেছে কিন্তু ফজরের পর রাজা সাহেবের এক বার্তাবাহক বাবু ফজল দ্বীন সাহেব আমার কাছে আসে আর বলে রাজা সাহেব এবং পাড়ার অন্যান্যরা বলেন, 'রাফা' এবং 'নুযূল' সম্পর্কীত ব্যাখ্যায় আমরা সন্তুষ্ট নই। আমি বললাম, তাহলে তারা কীভাবে সন্তুষ্ট হবে। তিনি বলেন, রাজা সাহেব এবং অন্যরা বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি মির্যা সাহেবকে কাফির না বলবেন আমরা মানব না। আমি বললাম, আমি কেন কাফির বলব? তিনি বলেন, মৌলভীরাও বলে থাকে। আমি বললাম, যেভাবে মৌলভী সাহেব মির্যা সাহেবকে কাফির বলে আমিও তাদের কাফির বলি (অর্থাৎ মৌলভীদের কাফির বলি, উর্দূতে তাদের এবং তার উভয়ের জন্য একই শব্দ 'উন' ব্যবহার হয় তিনি সেই সর্বনামের মাধ্যমে মৌলভীদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন) এরপর সে প্রশান্ত চিত্তে চলে গেল। যখন মজলিসে গিয়ে বললে যে তিনি মির্যা সাহেবকে কাফির আখ্যা দিয়েছেন, আবার সেই একই সুলতান আলী উচ্চস্বরে বললো, মিয়াঁ! তুমি দ্বিতীয়বার চোখে ছাই ঢালিয়েছো। তিনি মৌলভীকে কাফির বলেছেন। এটি হবে না তুমি আবার যাও। গিয়ে বল, লিখে দাও যে, আমি মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-কে (নাউযুবিল্লাহ) কাফির বলছি। আবার সে আসে, আমাকে দিয়ে এটি বলাতে চায়। এভাবে দু'দিন কেটে যায়, আমার হৃদয়ও কিছুটা সাহসী হয়ে উঠে। অতঃপর আমি পরিস্কার বলে দেই, যা কিছু আমি বলেছি তাই সঠিক। অর্থাৎ মির্যা সাহেব কে যারা কাফির বলে আমি তাদেরকে কাফির মনে করি। আর সে তখন নিরাশ হয়ে চলে যায়। তিনি পবিত্র কুরআনের এই আয়াত, الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ এখানে লিপিবদ্ধ করেন, আজকের দিনে সে সকল লোক যারা কাফির হয়েছে, তোমাদের ধর্মের বিষয়ে নিরাশ হয়ে গেছে অতএব তাদের ভয় করো না (সূরা আল্ মায়েদা: ৪)। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, তাদের কে ভয় পেও না বরং আমাকে ভয় কর। আর একথা বলার পরই মামলা শুরু হয়ে যায় এবং এমন পর্যায়ে চলে পৌঁছে যে, যাদের সম্পর্কে এই বিশ্বাস ছিল যে, তারা কখনো

মিথ্যা বলতে পারে না। আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য তারাও প্রকাশ্যে আদালতে মিথ্যা বললো। কিন্তু আমি তাদের প্রতি কোন পরওয়া করি নাই, না করবো। 'যারা মির্যা সাহেবকে কাফির মনে করে আমিও তাদের কাফির মনে করি' এতদসংক্রান্ত ঘটনা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নিকট বর্ণনা করলে হুযূর জোরে হেসে উঠেন এবং বলেন, ঈমান গোপন রাখারও একটি রীতি আছে। অর্থাৎ ঈমানকে লুকানো বা বিশৃংখলা এড়ানোর জন্য ঈমান গোপন রাখারও একটা রীতি রয়েছে যেভাবে সূরা মু'মিনে, এসেছে, وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ। আপনি খুবই ভাল করেছেন, পরিস্থিতি আঁচ করে আত্মরক্ষার রীতি অনুসরণ করেছেন।

সুতরাং এ হলো আহমদীদের উপর কঠোরতার কাহিনী, তাদের কে অধিকার থেকে বঞ্চিত করার কাহিনী, তাদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করার কাহিনী। এসব কেবল অতীতের কাহিনী নয় বরং যেভাবে প্রথমেও আমি বলেছি, আজ একশত তেইশ বছর অতিবাহিত হবার পরও এ সবই আহমদীদের সাথে ঘটে চলেছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আহমদীয়া জামাতের কাফেলা এ সকল বিরোধিতার পরও ক্রমশঃ উন্নতি করে চলেছে এবং ইনশাল্লাহ্ উন্নতির ধারা অব্যাহত থাকবে। পৃথিবীর প্রত্যেক প্রান্তের আহমদীরা ঈমানের বহিঃপ্রকাশে দৃঢ়তা লাভ করছে। আর ইমান আনার পর আল্লাহ্ তা'লার এই নির্দেশকে সামনে রাখে, فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ভয় যদি থেকে থাকে তাহলে খোদার, অন্য কোন সৃষ্টির নয়। আল্লাহ্ তা'লা জামাতের সদস্যদের ঈমান বৃদ্ধি করুন আর তাদের ঈমানকে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করুন।

আজও একই ধরনের একটি ঘটনা ঘটেছে। পাকিস্তানের দৃঢ় ঈমানের অধিকারীগণ, যারা আদর্শ দেখিয়ে থাকেন তাদের মধ্য থেকে আমাদের একজন আহমদী বুযূর্গকে শহীদ করা হয়েছে। নওয়াবশাহের মোকাররম মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেবের ছেলে জনাব চৌধুরী মুহাম্মদ আকরাম সাহেবকে শহীদ করা হয়েছে, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ।

চৌধুরী মুহাম্মদ আকরাম সাহেবের বংশের সম্পর্ক ফয়সালাবাদের গোখুয়ালের সাথে। তাঁর বংশে প্রথম আহমদীয়াত গ্রহণ করেন তাঁর দাদা হযরত মির্যা গোলাম কাদের সাহেব (রা.), তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেছিলেন। চৌধুরী মুহাম্মদ আকরাম সাহেব ফয়সালাবাদ জেলার গোখুয়ালে জন্মগ্রহণ করেন। শাহাদতের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল আশি বছর, তিনি গতকাল অথবা পরশু শহীদ হয়েছেন। তিনি নিজের অন্যান্য ভাই ও পিতার সাথে ঝুলখানপুরস্থ পৈতৃক জমির চাষাবাদ করতেন। এরপর ১৯৬০ সালে জায়গা-জমি বিক্রি করে নওয়াবশাহ্ চলে যান। ২০০৫ সালে তিনি পরিবারবর্গের সাথে অস্ট্রেলিয়ায় স্থানান্তরিত হন কেননা সেখানে তাঁর সন্তানরা বসবাস করছেন। গত বছরের নভেম্বর থেকে পাকিস্তানে রয়েছেন এবং এই দুর্ঘটনা ঘটে ২০১২ সালের ২৯ ফেরুয়ারী। তিনি তাঁর দৌহিত্র স্নেহের মুনীব আহমদ, পিতা জনাব রফিক আহমদ সাহেব এর সাথে দুপুর প্রায় ১টায় জামাতার দোকান থেকে বাসায় ফিরছিলেন। নওয়াবশাহেই যখন ঘরের কাছাকাছি পৌঁছান তখন দু'জন অজ্ঞাত পরিচয় মোটর সাইকেল আরোহী তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি করে যে কারণে তিনি আহত হন। হাসপাতালে নিয়ে যাবার সময় পথিমধ্যে আল্লাহ্‌র রাস্তায় প্রাণ বিসর্জন দেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ।

তাঁর সাথে তার দৌহিত্রের কটিদেশে গুলি লাগে, তারপর তা গিয়ে পাকস্থলীতে আঘাত হানে এবং তা ক্ষত-বিক্ষত হয়। তার অস্ত্রোপচার হয়েছে এবং বর্তমানে হাসপাতালের আই.সি.ইউ ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন আছে। আল্লাহ্ তা'লা তাকে সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন দান করুন। মরহুম শহীদ

১৯৬০ সালে নওয়াবশাহ্ আসার পর নিজের ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি জামাতেরও অনেক সেবা করেছেন। দীর্ঘদিন জামাতের সেবা করার তৌফিক লাভ করেন। প্রায় ৩৫ বছর নওয়াবশাহ্ জেলা এবং শহরের সেক্রেটারী মাল হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া জেলার নায়েব আমীর হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। মরহুম শহীদ একজন উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। ইবাদতকারী, নিয়মিত তাহাজ্জুদ আদায়কারী, অত্যন্ত পবিত্রচেতা ও সদাচারী মানুষ ছিলেন। অনেকেই আমাকে বলেছেন, যখন সেক্রেটারী মাল হিসাবে দায়িত্বরত ছিলেন তখন কেউ যদি বলত আমি চাঁদা দিব বা ফোনেও কেউ বলত আমি আজ চাঁদা দিব কখনো তাকে একথা বলতেন না যে, তুমি আমার নিকট নিয়ে আস বরং স্বয়ং তার বাসায় চলে যেতেন এবং দ্রুত চাঁদা নিয়ে রশিদ কেটে দিতেন। জামাতের জন্য গভীর ভালবাসা রাখতেন। জনকল্যাণমূলক কাজে সর্বদা অগ্রগামী থাকতেন। খিলাফতের প্রতি গভীর ভালবাসা রাখতেন আর খুতবাগুলো গভীর মনোযোগ ও উৎসাহের সাথে শ্রবণ করতেন। তাঁর ভেতর জামাতের কর্মকর্তাদের প্রতি আনুগত্যের বৈশিষ্ট্য ছিল অতি উন্নত। প্রেসিডেন্ট সাহেব বলেন, বয়সের দিক থেকে অনেক বড় হওয়া সত্ত্বেও আমার প্রতি আনুগত্য ও সম্মানের সাথে কথা বলতেন। এবার যখন অস্ট্রেলিয়া থেকে আসেন তখন আমাকে দিয়ে এতিম ও গরীবদের তালিকা প্রস্তুত করান তাদের মধ্যে আহমদী এবং গয়ের আহমদী সবাই অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। যতদিন এখানে থাকেন তাদেরকে নিয়মিত সাহায্য করেন। অনুরূপভাবে নওয়াবশাহ্তে জামাতের একটি কেন্দ্র দীর্ঘদিন থেকে বন্ধ ছিল তিনি অনেক পরিশ্রম ও চেষ্টা করে তা চালু করেন। এরপর সেটি নির্মাণের ব্যাপারে বলেন, আপনারা এর সংস্কার ও মেরামতের যে কাজ করতে চান তা আরম্ভ করুন। আমি অস্ট্রেলিয়া ফিরে গিয়ে আপনাদেরকে নির্মাণ কাজের জন্য অবশ্যই অর্থ প্রেরণ করব। আল্লাহ্ তা'লা সেই সুযোগ তাঁকে আর দেন নি। আল্লাহ্ করুন এখন জামাত স্বয়ং যেন সেই নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে। তাঁর শাহাদত বরণেরও প্রবল বাসনা ছিল। তাঁর পুত্রবধুর বর্ণনা হচ্ছে, যখনই তিনি কারো শাহাদতের সংবাদ শুনতে পেতেন তখন বলতেন, এই সম্মান নৈকট্যপ্রাপ্তরা লাভ করেন। পরিশেষে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর আকাঙ্খাকে পূর্ণ করেছেন। মরহুম শহীদ স্ত্রী ব্যতীত পাঁচ ছেলে এবং দু'জন মেয়ে রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তাঁর সন্তানরা সবাই বিবাহিত। আমি যেমন বলেছি, শহীদের চার ছেলে ও এক মেয়ে অস্ট্রেলিয়ায় বসবাস করেন। এক ছেলে ও এক মেয়ে পাকিস্তানের নওয়াবশাহ্তে বসবাসরত। আমি আকরাম সাহেবের দৌহিত্রের কথা বলেছি। তার স্নেহের নাতী মুনীব আহমদ সাহেবের বয়স আঠার-উনিস বছর সে উচ্চ মাধ্যমিকের ছাত্র। আল্লাহ্ তা'লা তাকে পূর্ণ সুস্থতা দান করুন। এখন জুমুআর নামাযের পর আকরাম সাহেবের গায়েবানা জানাযার নামায পড়াব, ইনশাআল্লাহ্।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)